জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ*

ভূমিকা

পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি কয়েক বছর আগেও ধারণা করা হয়নি যে, এই পরিবর্তন এতো দ্রুত ঘটবে যা এখন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য জলবায়ুতে প্রাকৃতিক কারণেই সবসময় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয় এবং নানা পরিবর্তন ঘটে। তবে বর্তমানে যে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে তা মূলত মনুষ্যসৃষ্ট। মানুষ কর্তৃক পরিচালিত উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন, জ্বালানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, ভূমি ও বন ব্যবহার, ভোগবিলাস ইত্যাদি নানা কর্মকান্ড থেকে দীর্ঘদিন ধরে উৎসারিত এবং বায়ুমন্ডলে পুঞ্জিভূত গ্রীনহাউজ গ্যাসের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো দ্রুত বাড়বে বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আর এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্ম দিচ্ছে। পৃথিবীর দিকে দিকে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং হ্যারিকেনের সংখ্যা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু, উঁচু পাহাড় এবং অন্যত্র জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমুদ্রস্ফীতি ঘটতে শুরু করেছে। জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এসকল পরিবর্তন প্রাকৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ঘটাচ্ছে।

বিগত ১৫ নভেম্বর তারিখে ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানার পর একটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপন করা হচ্ছে যে, ২০০৭ সালে বাংলাদেশে যে পরপর দুটো বড় বন্যা এবং তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ঘূর্ণিঝড় ঘটে গেল এগুলো কি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে নাকি সাধারণ প্রাকৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ। এই দুটো বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় যে সময়ে ঘটেছে বাংলাদেশে ঐ সময়ে সাধারণভাবে এরকম দুর্যোগ ঘটতে পারে। এটি একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে, এই বিধ্বংসী প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই ঘটেছে। তবে একথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, এগুলোর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেননা একই বছরে তিন তিনটি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশেই ঘটেছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসময়ে বা অধিক জোরালো বৃষ্টিপাত হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে। পাশাপাশি দ্রুত জমাটবাঁধা বরফ সর্বত্র গলে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনাকে একসাথে বিবেচনা করলে জলবায়ু পরিবর্তন যে দ্রুততর হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর সর্বত্র যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু সংক্রান্ত প্যানেল (আইপিসিসি)-এর অভিক্ষেপনের মিল রয়েছে। এটি প্রায় নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও ঘনঘন এবং আরো বিধ্বংসীরূপে আবির্ভূত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দেশে। কেননা, বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি আরো গতি পাচ্ছে।

আইপিসিসি চতুর্থ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ও বিশেষণ

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

আইপিসিসি পরিচিতি

প্রথমে আইপিসিসি সম্বন্ধে পরিচিতিমূলক কিছু কথা বলা যায়। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্ত:রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল বা সংক্ষেপে আইপিসিসির (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) চতুর্থ মূল্যায়ন ২০০৭ সালে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার দ্বারা গৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে, দ্বিতীয় মূল্যায়ন ১৯৯৫ সালে এবং তৃতীয় মূল্যায়ন ২০০১ সালে।

এসকল মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য (ক) জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; (খ) পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর কী প্রভাব পড়ছে ও পড়তে পারে এবং ফলে মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে সকল ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায়; এবং (গ) গ্রীনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ নিয়ন্ত্রণ।

অভিজ্ঞতার আলোকে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি কাঠামো দাঁড়িয়েছে যে, একটি মূল্যায়নকে মূলত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ভাগ এক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নামে পরিচিত। উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় যথাক্রমে ওয়ার্কি গ্রুপ-১, ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ এবং ওয়ার্কি গ্রুপ-৩ এর উপজীব্য বিষয়। এছাড়া, প্রয়োজনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট তৈরি করেন তবে এগুলো গৃহীত হতে হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকার দ্বারা। তাই একটি রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর সরকারসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র হয়ে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন করে রিপোর্টটি গ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞরা এই পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকেন। এসকল মূল্যায়ন প্রস্তুত করা হয় বিশ্বজোড়া সম্পাদিত গ্রহণযোগ্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্ম এবং বিভিন্ন পর্যায়ের খসড়ার ওপর সারা বিশ্ব থেকে রিপোর্ট প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেক বিশেষজ্ঞের এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকারি মতামত গ্রহণ ও বিচার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে।

প্রাপ্ত কিছু তথ্য ও বিশে-ষণ

এবার আইপিসিসি চতুর্থ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের দিকে নজর দেয়া যাক। এই মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে, এটি প্রায় নিশ্চিত যে, বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণতা গড়ে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে, এমন কি তা ৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি বৈশ্বিক গড় সমুদ্রস্ফীতি একই সময়ে ১৮ সেন্টিমিটার থেকে ৫৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ঘটতে পারে। অবশ্যই উষ্ণতাবৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতি সংক্রান্ত এই সংখ্যাগুলো বৈশ্বিক গড়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল এই আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। (ওয়ার্কিং গ্রুপ-৪-এর রিপোর্ট-২০০৭ দ্রঃ)

যে পরিমাণ গ্রীনহাউজ গ্যাস বায়ুমন্ডলে পুঞ্জিভূত আছে তাতে যদি নতুন গ্রীনহাইজ গ্যাস আর যোগ নাও করা হয়, তবুও বর্তমান শতাব্দী ধরে বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ বেড়েই চলেছে এবং বাড়তেই থাকবে। এটি কমিয়ে আনার তেমন যথাযথ উদ্যোগ উন্নতবিশ্ব এখনও বাস্তবায়ন করছে না। চীন, ব্রাজিল, ভারতসহ যে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ উল্লেখযোগ্য ও ক্রমবর্ধমান গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ করছে তারাও এ পথে হাঁটছে না। আর সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হলেও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণে যে দেশগুলো এক্ষেত্রে কার্যকর

ভূমিকা রাখতে পারে সেই বৃদ্ধির হার কমতে পারে কিন্তু উদগীরণ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে অনেকদিন ধরে।

দেখা যায় যে, ১৯৭০-২০০৪ সময়ে মানুষ কর্তৃক পরিচালিত নানা কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ ৭০ শতাংশ বেড়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক দায়ী হচ্ছে জ্বালানিখাত (নি:সরণ ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি), পরিবহন (১২০ শতাংশ), শিক্ষা (৬৫ শতাংশ) এবং ভূমি ব্যবহার ও ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এবং বন ব্যবহার (৪০ শতাংশ)। ওজন বেষ্টনী হ্রাসকারী গ্যাসসমূহের নি:সরণ মন্ট্রিয়ল চুক্তি অনুসরণের কারণে ১৯৯০-২০০৪ সাল সময়ে প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাদের গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ বৃদ্ধির হার কিছু কমেছে। কিন্তু মোট হ্রাস নিতান্তই কম, আর মোট বৃদ্ধি অনেক বেশি। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দ্রুততর হচ্ছে। (ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩ এর রিপোর্ট-২০০৭ দ্রঃ)

২০০১ সালে সমাপ্ত তৃতীয় মূল্যায়নে (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২) সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ (natural systems) ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড (human systems) দু'এর উপরই এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে[১১]। চতুর্থ মূল্যায়নে (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২) এই সিদ্ধান্তই আরো জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তদুপরি বিভিন্ন মহাদেশ এবং প্রায় সকল মহাসাগর সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই মূল্যায়নে বলা হয়ে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন, বিশেষ করে উষ্ণতাবৃদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটছে। এই রিপোর্ট (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২) থেকে আরো জানা গেছে:

সর্বত্রই জমাটবাঁধা বরফ ক্রমবর্ধমানভাবে গলে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে। পাহাড়গুলোতে ধ্বস নামছে এবং মেরু অঞ্চলগুলোতে ও সমুদ্রে জমাটবাঁধা বরফে পরিবর্তন ঘটছে।

দ্রুত বরফ গলে যাওয়া এবং বৃষ্টির প্রকোপ বাড়ার কারণে জলপ্রবাহের উচ্চতার পর্যায় এবং সময় বদলে যাচ্ছে; হ্রদ এবং নদীর জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বদলে যাচ্ছে জলের গুণগত মানের কাঠামোও; এবং ক্রমবর্ধমান উষ্ণতাবৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলীয় এলাকাসমূহ উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন এবং জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

কৃষি (খাদ্য, শস্য, আঁশ ইত্যাদি) বন সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শিল্প উৎপাদন, মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান।

মোদ্দা কথা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনধারণ বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি

১. • প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় আছে: Natural systems at risk include glaciers, coral reefs and atolls, mangroves, boreal and tropical forests, polar and alpine ecosystems, prairie wetlands, and remnant native grasslands.
• আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আওতায় আছে: Human systems that are sensitive to climate change include mainly water resources; agriculture (especially food security) and forestry; coastal zones and marine systems (fisheries); human settlements, energy, and industry; insurance and other financial services; and human health. The vulnerability of these systems varies with geographic location, time, and social economic and environmental conditions.

এবং তা আগামী দিনগুলোতে বাড়তেই থাকবে, বিশেষ করে যদি অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড এবং মানুষের জীবন-যাপন যেভাবে চলে আসছে সেভাবেই চলতে থাকে।

একথটিও জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে উঁচু মাত্রার ঝুঁকির সম্মুখীন অর্থাৎ এই দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের প্রথম সারিতে রয়েছে। কিন্তু উদ্ভূত অবস্থা মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের খুবই সীমিত। চতুর্থ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্য ও উপসংহারের দিকে নজর দিলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কী পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে তা প্রতীয়মান হবে:

সবকিছু যেমন চলছে তেমন চললে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে আরো ১২০ কোটি পর্যন্ত মানুষ এশিয়ায় এবং আরো ২৫ কোটি পর্যন্ত মানুষ আফ্রিকায় পানি-স্বল্পতার মুখোমুখি হতে পারে। এছাড়াও ভারতে ভূট্টা ও গমের উৎপাদনশীলতা ৫ শতাংশের মতো কমে যাবে।

যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে তবে চীনে চালের উৎপাদনশীলতা ১২ শতাংশ কমে যাবে, এশিয়ায় ২০ লাখের মত মানুষ উপকূলীয় বন্যার মুখোমুখি হবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় আরো ১৬০ কোটি পর্যন্ত মানুষ পানি-স্বল্পতার মুখোমুখি হতে পারে। উষ্ণতা আরো বেশি হলে সমস্যাগুলো আরো প্রকট হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি পৃথিবীর সেই সমস্ত এলাকায় বিশদভাবে দেখা দিবে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান (যেমন ঘনবসতি, অর্থনৈতিক অতি দুর্বলতা, নিম্নস্তরের মানব-সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অব্যবস্থা, ভূমির মানের অবনয়ন, বিশ্বায়ন-উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সমস্যা, এমনিতেই নানান ধরনের অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব রয়েছে)।

কোনো অঞ্চলে বা দেশে কার্যকর এবং প্রয়োজনমত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হলে সেখানে উপর্যুক্ত অভিঘাতসমূহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এই লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা এই রিপোর্ট (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২) থেকে পাওয়া যায়:

একদিকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়ে (adaptation) নেয়ার উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং অপরদিকে অবশ্যই গ্রীনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি যাতে উষ্ণায়ণ প্রক্রিয়া আরো গুরুতর রূপ ধারণ না করে এবং সময়ে তা নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়া এখনই জোরালোভাবে শুরু না করা হলে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ এক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পরিকল্পনা সহস্রাব্দ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে নীতিমালা ও পরিকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। টেকসই উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন একসূত্রে গ্রথিত হতে হবে। এর মূল সুর সকল প্রকার উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নানা ঝুঁকির যথাযথ মূল্যায়ন এবং সেগুলোর নিরসনে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত স্টার্ন রিপোর্ট

যুক্তরাজ্যের স্টার্ন (Nicholas Stern) রিভিউতে খাপখাওয়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, অতি দরিদ্র দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, জলবায়ু-ব্যবস্থাপনা উন্নয়ননীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে এবং উন্নত দেশসমূহ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র দেশগুলোকে উন্নয়ন সহায়তা দিতে হবে।

এই রিভিউতে আরো বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-এর উপর আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ ও উন্নয়নে এবং বন্যা ও খরা সত্ত্বেও ফলন ভাল হবে এরকম শস্যের উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য

- আইপিসিসি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বিশ্ববাসীকে একযোগে একদিকে গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যথাযথ নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- উন্নতবিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ করে মনুষ্যসৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়েছে। যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং ঘটবে তার জন্য উন্নতবিশ্বই মূলত দায়ী। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা-ব্যবস্থা নির্ধারণে এবং বাস্তবায়নে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেয়া উন্নত দেশসমূহের দায়িত্ব।
- যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বিতভাবে পরিচালনা না করলে সফলতা আসবে না অথবা টেকসই হবে না তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য যাতে অর্জিত হয় তার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিমাণ ও কাঠামোও অনুকুল হতে হবে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও টেকসই উন্নয়নের আঙ্গিকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কার্যকর নীতি ও প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যই অগ্রগণ্য এবং দারিদ্র্য-নিরসনে তা অবশ্যই ন্যায্যভাবে সুবন্টিত হতে হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যাতে পরিবেশ-বান্ধব হয় সেই প্রয়াস নেয়া টেকসই উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ-প্রক্রিয়া।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ভুক্তভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠী যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যাতে দ্রুত ঘটে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।

বাংলাদেশ

ঘূর্ণিঝড় সিডর একটি টনক নাড়ানো বিধ্বংসী দুর্যোগ। তদুপরি ২০০৭-এই দুটো বন্যার পর এটির আঘাত। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্ফীতির কারণে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলার শিকার হবে বলে দেখা যাচ্ছে। বন্যা দুটো ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পুরো হিসাব এখনো জানা যায়নি। পূর্ণ

মূল্যায়নে আরো সময় লাগবে। তবে ব্যাপ্তি ও পরিমাণ যে বিশাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অসংখ্য মানুষের এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য আকারের পুনর্বাসনের প্রয়োজন। দেশী-বিদেশী যে অনুদান প্রাপ্তি ঘটছে তা ছাড়াও উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে। এতে উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। কতটুকু হতে পারে তা নির্ভর করছে কি পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করা হবে এবং কোন ধরনের বা কোন কোন প্রকল্প কাটছাট করা হবে তার ওপর। বাজেট কাটছাট ও পুনর্বিন্যাসে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সীমিত করা বা বাদ দেয়া হবে বলেই ধারণা করা যায় যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব যতদূর সম্ভব কম পড়ে।

অত্যন্ত ঘনবসতির এই দেশে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে বাধ্য হয়ে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষই সিডরের আঘাতে মূলত মারা গেছেন, নিঃস্ব হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকে বাড়িঘর-গরুছাগল ও অন্যান্য সম্পদ যা কিছু ছিল সবই হারিয়েছেন, জেলেরা নৌকা ও জাল হারিয়েছেন, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীরা মজুদ পণ্যদ্রব্যসহ দোকানঘর হারিয়েছেন, দিনমজুররা কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছেন। অবশ্য এ সকল এলাকায় বসবাসকারী অদরিদ্র অনেকে দরিদ্রদের কাতারে যোগদান করেছেন। উদ্ধার-ত্রাণ-পুনর্বাসন যা দুর্যোগ আঘাত হানলেই পরপর বা সমান্তরালভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়, বাংলাদেশে অতি পরিচিত সেই কাজগুলো আবারও করতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে এই কাজগুলো আরো ঘনঘন আরো ব্যাপকভাবে করতে হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বাংলাদেশ-সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য ও বিশ্লেষণ এখন তুলে ধরা যাক। আইপিসিসি রিপোর্টে সাধারণত দেশভিত্তিক আলোচনা তেমন থাকে না, অঞ্চলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা এবং উপসংহার থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাক্কলিত বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক প্রভাব কিভাবে কোন দেশে রূপলাভ করবে তা সেদেশে বিরাজমান বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হয়। আইপিসিসি চতুর্থ মূল্যায়ন (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ এর রিপোর্ট-২০০৭ দ্র:) থেকে জানা যায় যে, ***দক্ষিণ এশিয়ায়*** প্রাক্কলিত জয়বায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিম্নোক্তভাবে পড়বে:

হিমালয়ের জমাটবাধা বরফ দ্রুত গলার কারণে প্রাথমিকভাবে বন্যার প্রকোপ বাড়বে এবং পাথর-ধ্বসও বাড়বে। তবে ২-৩ দশক পর যখন জমাটবাধা বরফ অনেক কমে যাবে তখন সংশ্লিষ্ট নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ কমে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মিঠা পানির প্রাপ্যতা, বিশেষ করে বড় বড় নদী অববাহিকায় (যেমন: গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা) কমে যাবে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ পানি-সংকটে পড়তে পারেন।

উপকূলীয় এলাকাগুলোর জন্য সমুদ্র থেকে জলোচ্ছ্বাসের ফলে বন্যার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে।

একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শস্যের উৎপাদনশীলতা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এই বিষয়টি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগর সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিবেচনায় নিলে এটি পরিষ্কার যে, ক্ষুধার ঝুঁকি কোনো কোনো দেশে অতি উঁচুমাত্রায় চলে যাবে। বিভিন্ন প্রকার পানি ও জীবাণুবাহিত রোগের কারণে স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

এখন বাংলাদেশের দিকে নজর দেয়া যাক। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বড় বড় এই তিনটি নদী-অববাহিকার সর্বনিম্নে বাংলাদেশের অবস্থান এবং দেশের বিশাল অংশ সমুদ্রপিঠ থেকে সামান্য উপরে অবস্থিত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনেক নিম্নাঞ্চল রয়েছে এবং বন্যার কারণে নদীভাঙ্গন ব্যাপক আকারে

ঘটে থাকে এবং ফলে প্রতিবছরই অনেক মানুষ ভিটেমাটিহারা, বাস্তুহারা হয়ে বিপর্যস্তদের কাতারে যোগ দিতে বাধ্য হন। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। তাই বন্যার প্রবণতা এমনিতেই বাংলাদেশে বেশি, আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত বেড়ে গেলে এদেশে বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপ যে অনেক বেড়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও সমুদ্রস্ফীতির কারণে বন্যা দীর্ঘায়িত হবে এবং বাংলাদেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা স্থায়ীভাবে প্লাবিত হয়ে যেতে পারে আর লবণাক্ততা দেশের অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রথম সারির ভুক্তভোগী দেশসমূহের একটি বাংলাদেশে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের পরিস্থির উদ্ভব ঘটতে পারে তার একটি পরিমাণগত ধারণা প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নে দেয়া গেল:

বাংলাদেশ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ২° ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উষ্ণতাবৃদ্ধি এবং ৪৫°

উষ্ণতাবৃদ্ধি (সমুদ্রস্ফীতি)	দেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো	সরাসরি পরিবর্তন	প্রভাব সরাসরি	ফলস্বরূপ
০.৫°-২.০° সেলসিয়াস (১০-৪৫ সেন্টিমিটার)	✔ সুন্দরবন	✔ ১৫% (প্রায় ৭৫০ বর্গ কিলো মিটার ভূমি) স্থায়ী ভাবে প্লাবিত, মূলত উপকূলীয় এলাকায়	✔ বন্যপশু বিনাশ ✔ বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি বিনাশ	✔ অর্থনৈতিক ক্ষয় ক্ষতি ✔ অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানে নিরাপত্তাহীনতা
>২.০° (৪৫সেন্টমিটার একই সাথে ১০শতাংশ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি	✔ সকল নিম্না ঞ্চল	✔ লবণাক্ততা বৃদ্ধি ✔ স্থায়ীভাবে প্লাবিত এলাকা ২৩-২৯ শতাংশ বৃদ্ধি	✔ বন্যার ব্যাপ কতা বৃদ্ধি ✔ বর্ষাকালে ধান চাষের প্যাটার্ন পরিবর্তন	✔ জীবন ও জান মালের ঝুঁকি ✔ স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি ✔ ধানের উৎপাদন শীলতা হ্রাস

উৎসঃ

সেন্টিমিটার বা তার বেশি সমুদ্রস্ফীতির মুখোমুখি হতে পারে তা জোর দিয়ে বলা যায়। এর পরিণতি দেশের জন্য ভয়াবহ হবে। স্থায়ীভাবে প্লাবিত হয়ে যাওয়া ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল বসবাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য উপযুক্ততা হারাবে। এসব এলাকার মানুষ শুধু যে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের কবলে পড়বেন তা-ই নয়; তাদের মধ্যে অসংখ্যজন উদ্বাস্তুর কাতারে যোগদান করতে বাধ্য হবেন।

বলাবাহুল্য বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপ বাড়লে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়বে। ঘনঘন বিধ্বংসী বন্যার আবির্ভাব ঘটলে বাড়িঘর, মাঠের শস্য, এবং ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, টেলিযোগাযোগ ও স্কুল-কলেজসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো বারবার এবং ঘনঘন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটি পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হতে না হতেই আবার কোনো মারাত্মক দুর্যোগ এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিতে পারে। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে ঘনঘন এবং ফলে দীর্ঘমেয়াদে।

বাংলাদেশে বড় বড় বন্যার ওপর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বন্যার সময় পানি ও জীবাণুবাহিত নানা রোগের (ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, চর্মরোগ ইত্যাদি) ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে আর ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে যার ফলে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এ সকল গবেষণা থেকে এও দেখা গেছে যে, বিধ্বংসী বন্যার ফলে অতিদরিদ্র মানুষ নি:স্ব হয়ে যান, দরিদ্ররা অতিদরিদ্র হয়ে যান, এবং অনেক অদরিদ্র দরিদ্রদের স্তরে নেমে যান। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত ও বন্যার প্রকোপ বেড়ে গেলে বিশাল জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি বিস্তর বাড়বে যদি না যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হতে পারে যার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝুঁকি বাড়বে এবং শস্য, মৎস্য, বনাঞ্চল ও পশু উৎপাদনে সমস্যা প্রকটতর হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ মূল্যায়ন (ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ রিপোর্ট-২০০৭) অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্যের উৎপাদনশীলতা এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বাস্তবতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হতে পারে। অর্থাৎ এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শস্যের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। এ ছাড়াও এমনিতেই নদীভাঙ্গন এবং ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে দেশে মোট কৃষিজমির পরিমাণ বছরে প্রায় ১% হারে কমে যাচ্ছে। তদুপরি সমুদ্রস্ফীতি ও লবণাক্ততার কারণে যদি দেশের বর্তমান মোট কৃষি জমির এক উল্লেখযোগ্য অংশ আর কৃষিকাজের জন্য পাওয়া না যায় তবে সব মিলিয়ে আজ থেকে ৩০-৪০ বছরের মধ্যে দেশে এক ভয়াবহ খাদ্যসংকট সৃষ্টি হতে পারে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ে জমাটবাধা বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে এবং এর ফলে শুষ্কমৌসুমে আঞ্চলিক নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ প্রাথমিকভাবে বাড়বে কিন্তু পরে তা দ্রুত কমে যাবে এবং পানীয় জল, সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সংকট সৃষ্টি করবে অথবা বাড়াবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (যেখানে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে) ইতোমধ্যেই পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত। গঙ্গা থেকে প্রাপ্ত পানি আরো কমে গেলে এই অঞ্চলে সংকট আরো তীব্র হবে। অবশ্য গঙ্গা দিয়ে শুষ্কমৌসুমে এখন যে পানি আসে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে তা ধাবিত করার কোনো ব্যবস্থা গঙ্গায় না থাকায় তার অধিকাংশই বঙ্গোপসাগরে চলে যায়। ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংকট আরো তীব্র হতে পারে যদি দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়।

আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জমি ও পানির প্রাপ্যতায় ক্রমবর্ধমান সংকট সমাজে অস্থিরতা ও হানাহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশের উত্তর-পাশ্চিমাঞ্চল খরা-প্রবণ। এই অঞ্চলের অনেক এলাকায় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের প্রকট অভাব থাকায় অসংখ্য মানুষ মঙ্গা-আক্রান্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই এলাকায় খরার প্রকোপ বাড়তে পারে এবং ফলে অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে।

সুন্দরবনে বিশ্ব উত্তরাধিকার (World Heritage) সাইট এবং রামসার (Ramsar) সাইট রয়েছে। এগুলো সংরক্ষণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরো সুন্দরবন সংঘাতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সিডর সুন্দরবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনেক পশু-পাখি হারিয়ে গেছে। এর পুনর্বাসন একটি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। অবশ্য সুন্দরবন-বেষ্টনির কারণে জনপদে সিডরের আঘাতের তীব্রতা কিছু কমে যাওয়ায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বেশ কিছু কম হয়েছে।

উপসংহার ঃ করণীয়

বাংলাদেশ

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে বাংলাদেশ তা মোকাবেলা করা বা তার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর (adaptation) লক্ষ্যে পথ ও কর্মসূচি গ্রহণ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের কাজ আর কালবিলম্ব না করে শুরু করা জরুরি । কিন্তু দেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বাড়লেও এখনও এর অভিঘাত মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ সীমিতই থেকে গেছে । তবে সিডর পরবর্তী সময়ে উদ্ধার-ত্রাণ-পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ জোরদার হতে হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । এ কাজ অবশ্য সরকার একা করতে পারবে না । যারা অবদান রাখতে পারবেন সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং ব্যাপক জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তারাও অবদান রাখতে পারবেন ।
- তবে জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা এবং মানবদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; বিদ্যমান অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন এবং সেই ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন ধারণার (অর্থাৎ একযোগে সুবন্টিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিভিত্তিক সামাজিক বিকাশ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সমন্বিত নীতি, কৌশল ও প্রক্রিয়া) আওতায় নীতিনির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আর যে সকল কর্মকান্ড হাতে নেয়া হয় সময়ে সময়ে তার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে যাতে প্রয়োজনে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় ।
- সক্ষমতা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাস্তবতার যথাযথ মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাপ্তি, অর্থনৈতিক সঙ্গতি, মানবদক্ষতা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, যথাযথ আইনি ব্যবস্থা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তাদের মধ্যে শুধু স্বল্পমেয়াদে নয়, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদের চিন্তা-ভাবনাও থাকতে হবে । এসকল বিষয় বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা খুবই নিচু পর্যায়ের । বলাবাহুল্য এই সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে আশু এবং কার্যকর নজর দেয়া জরুরি ।
- গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য তবুও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত না করে গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ আরো কমিয়ে আনার চেষ্টা এদেশেরও করা উচিত ।
- যেহেতু উন্নত দেশসমূহ মনুষ্যসৃষ্ট এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাই এর অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের এবং ভুক্তভোগী অন্যান্য দরিদ্র দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি নিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হবে ।

আন্তর্জাতিক

- দ্রুত ঘটতে শুরু করা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বিশ্বব্যাপী অভিঘাত মোকাবেলায় বিশ্বের সকল দেশকে একযোগে তবে সঙ্গতি ও বাস্তবতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব

পালনে উদ্যোগী হতে হবে। সব দেশকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে কেননা বৈশ্বিক জলবায়ু যেহেতু ভাগ করা যাবে না, প্রতিকার না করা হলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শুধু দরিদ্র দেশসমূহ বিপর্যস্ত হবে না, সময়ে উন্নত দেশসমূহও ক্রমবর্ধমানভাবে দুর্ভোগের শিকার হবে।

- অপরদিকে উন্নত বিশ্বকে গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ কমিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দ্রুত গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ বৃদ্ধিকারী চীন ও অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশকেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এই কার্যক্রম শুরু করতে হবে এখনি। যাতে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেরি করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।
- গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকার সংবলিত কিয়োটো চুক্তির (প্রটোকল) পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছ থেকে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চুড়ান্ত সমর্থন আসতে দেরি হওয়ায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যাওয়ায় এই চুক্তি থেকে কোনো ফলই পাওয়া যয়নি। এর মেয়াদও শেষ হচ্ছে ২০১২ সালে।
- ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বর্তমানে অনুষ্ঠানরত সম্মেলনে ভবিষ্যতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ কমিয়ে আনা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সমূহের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর ব্যবস্থা জোরদার করা, এবং এতদসংক্রান্ত প্রযুক্তি ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য জি-৮ এর সদস্য দেশগুলোর সদিচ্ছা থাকলে এবং চীনসহ যে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট এবং ক্রমবর্দ্ধমান গ্রীনহাউজ উদগীরণ করছে সেদেশগুলো সহায়তা করলে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় (অর্থাৎ গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎসারণ কমানো, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা; উন্নয়নশীল, বিশেষ করে দরিদ্র এবং সর্বাধিক ভুক্তভোগী দেশগুলোকে উন্নত বিশ্বের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া) উপযোগী আন্তর্জাতিক সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু সমঝোতাই সব নয়; সমঝোতা হলে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শুধু দরিদ্র দেশসমূহ নয় গোটা পৃথিবীর মানুষকে, এমনকি পৃথিবীটাকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।
- সবশেষে বলতে চাই যে, যেহেতু দক্ষিণ এশিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একই ধরনের বিভিন্ন অভিঘাতের মুখোমুখি হবে তাই এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে যেমন একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একযোগে কার্যক্রম হাতে নেয়া, এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অভিন্ন সার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে একযোগে উদ্যোগ নেয়া এবং দেন-দরবার করা, ইত্যাদি। তাই জলবায়ু পরিবর্তন-ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সদস্য দেশ এগিয়ে আসলে প্রত্যেক দেশই এবং এই অঞ্চলের ব্যাপক মানুষ উপকৃত হবে।